প্রকল্পঃ পর্দানশীন

ভূমিকা

কৌরব অনলাইন ও কৌরব পত্রিকার এক চিরকালীন স্বপ্ন ছিলো একটা সাহিত্য সংখ্যা সম্পাদনা করা সিনেমার মতো। চলচ্চিত্র সম্পাদনার শৈলিতে সাহিত্য সম্পাদনা। এই স্বপ্ন নিয়ে সাহিত্য সম্পাদক আর্যনীল মুখোপাধ্যায় ও চলচ্চিত্র সম্পাদক অর্ঘ্যকমল মিত্র আলোচনা করেন হিউস্টন শহরে, ২০১৫র গ্রীষ্মে। একটা প্রকল্প শুরু হয়। অর্ঘ্যকমলের একটা আভাসকাহিনিকে বিন্যাস করে আর্যনীল এক ধারাবাহিক আখ্যান লেখেন 'পর্দানশীন' নামে। কবিসম্মেলন পত্রিকায়। পরবর্তীতে এই প্রকল্প দুমুখো হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লেখা হয়। কাহিনি পরিবর্ধন ও ইংরেজি সংলাপ লেখেন প্যাট ক্লিফর্ড। পাশাপাশি সাহিত্য-প্রকল্পের জন্য কাহিনির সারসংক্ষেপ করে একদল কবি, গদ্যকার ও প্রাবন্ধিককে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এঁরা যাতে কাহিনিকে অবলম্বন করে মৌলিক কবিতা, গল্প, অন্যান্য রচনা লিখে উঠতে পারেন। যেভাবে একটা গল্পকে ছবি করতে নানা অভিনেতা, কলাকুশলী তাদের যৌথ কাজকে একত্র করে চলচ্চিত্রায়িত করেন, সেইভাবেই একদল কবি, লেখক গড়ে তুলবেন এক যৌথ সাহিত্য প্রকল্প এই কাহিনিসারকে ঘিরে। একটা একখন্ড, একশিলা লেখা তৈরি হবে সকলের লেখা নিয়ে। কোনটা কার লেখা চেনা যাবেনা আপাতদৃষ্টিতে। সিনেমার টাইটেলের মতো সব লেখকের নাম ছাপা হবে পত্রিকার শেষ পাতায়।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন দাশ ও সুমনা দাশ এই প্রকল্পে মৌলিক লেখা জমা দেন। এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো সুমনার উপকাহিনি ও সন্দীপনের কবিতা।

মূল কাহিনি পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই বৃদ্ধের আচমকা আন্তর্জালিক সখ্যতাকে কেন্দ্র করে। অসীমাভ চট্টোপাধ্যায় এক কলকাতাস্থ, সত্তরোর্ধ, অবসৃত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। সুকল্যাণ ঘোষ ফ্লোরিডায় বসবাসকারী এক কারিগরি গণিতবিদ স্বাধীন কনসালট্যান্ট। সুমনার উপকাহিনি এই দুই বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার এক নতুন আদানপ্রদান নিয়ে।

উপকাহিনি সংযোজন

সুমনা দাশ

অসীমাভ দেখলেন সুকল্যাণ মুচকি মুচকি হাসছেন। কৌতুহল হলো অসীমাভর, তবে সরাসরি হাসির কারণ না জানতে চেয়ে বললেন,

- কি ব্যাপার, কোনো কারণে বেশ মজা পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!

-মজা. . . হ্যাঁ, তা একরকম. . . তবে সেটা এসেছে একটা realization থেকে. . .

- কীসের realization ?

- সেটা এই যে, আমাদের চারপাশে যেসব মানুষদের আমরা দেখি, তাদের জীবনের ভেতরকার অনেক খবরই আমরা রাখি না। বা আমাদের মতো করে একরকম ভেবে নিই। এই ভেবে নেওয়াটা একই সঙ্গে ভালো আবার খারাপও. . .

- সেটা কীরকম?

- আসলে প্রতিদিন যে মুখগুলোকে আমরা দেখি তাদের মনের মধ্যে একএকটা খোপে বসিয়ে দিই। অনেকটা চকোলেটের বাক্সের মতো খোপকাটা আছে আমাদের মনের মধ্যে যেখানে একএকটা মুখ গড়িয়ে এসে দিব্যি এঁটে যায়। তারপর আর তাকে নিয়ে আমরা বিশেষ ভাবি না। বিভিন্ন সামাজিক বা সাহিত্যিক বর্গগুলিও অনেকটা তেমনই। সেগুলো তৈরির পেছনে বিশেষ কোনো কারণ থাকে, ইতিহাস থাকে, রাজনীতি তো থাকেই। কিন্তু যখন আমরা সেই পারিভাষিক বা বর্গনাম ব্যবহার করি, তখন এতকিছু তো ভাবি না, মনের মধ্যে আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা কোনো একটা খোপে ফেলে দিই। আবার এই ধারণার খোপগুলো, সেগুলো কীভাবে তৈরি হয়? বিভিন্ন মিডিয়ায় পড়া, দেখা বা শোনা, লোকের মুখ থেকে ছিটকে আসা মন্তব্য, আলোচনাসভার অংশ বিশেষ, আমাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, সচেতন, অর্ধসচেতন বা অসচেতন অবস্থায় আমাদের মনের মধ্যে ঢুকছে, যেভাবে বাতাসে ভাসমান ধলোর কণা আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে টেনে নিই, অনেকটা সেইরকম. . .

- হুম্. . . তা একে একই সঙ্গে ভালো আবার খারাপ বলছেন কেন?

- ভালো এই জন্য যে মনের মধ্যে কোনো একটা খোপ তৈরি থাকলে আপনি কোনো কিছুকে সহজেই accommodate করে নিতে পারেন, মানে, আগে থেকে প্লট হিসেবে জমি কেনা থাকলে বাড়ি বানাতে যেমন সুবিধা হয় আরকি. . .। নতুন কোনো কিছু শুনলেই তখন মনের রাডার যন্ত্র সংকেত দিতে শুরু করে, 'দেখে মনে হয় যেন চিনি উহারে'। আর তারপরেই একেবারে উল্লসিত হয়ে 'চিনি গো চিনি তোমারে' গাইতে গাইতে ধরে এনে সেই নির্দিষ্ট খোপে ঢুকিয়ে দেয়। আর সমস্যাটা এখানেই। আগের উদাহরণটা টেনে এনে বলা যায়, ফাঁকা জমি ফেলে রাখলে জবরদখল হবেই, এবার আসল মালিক এসে বাড়ি বানাতে চাইলেই তো হবে না, জবরদখলকারীদের উৎখাত করতে হবে. . . এখন সেই দখলকারী যদি বিশেষ বলে বলীয়ান হয়, মানে তার মাথার ওপর যদি শক্তিশালী কোনো হাত থেকে থাকে তবে তো তাকে তোলা মুশকিল। অবস্থাগতিকে এমনও হতে পারে, আসল মালিককেই হয়তো জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হলো। মানে, আপনার মনের ধারণাটা যদি দেশী বিদেশী মিডিয়ার প্রচারে পুষ্ট হয়ে থাকে বা অ্যাকাডেমিক জগতের হোমড়াচোমড়াদের মুখে শোনা কিছু কথা যদি সেখানে খুঁটি গেঁড়ে বসে তবে তাকে উপড়ে ফেলা কঠিন. . .

- দাঁড়ান দাঁড়ান, বিষয়টাতো ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যিক তত্ত্ব থেকে জমির দখলদারি, প্রোমোটারচক্র— সব কিছু একসঙ্গে এনে ফেললেন যে। একটু স্পষ্ট করুন, নইলে গুলিয়ে যাচ্ছে . . .

- Sorry, আসলে আমি নিজের মনে বিষয়গুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছিলাম, বলতে পারেন thinking aloud । আর তাতেই দেখলাম, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই পরস্পর সম্পৃক্ত. . . । বিষয়টা খুলে বলি তবে আপনাকে। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের সাবওয়েতে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটি একটা ঠিকানা খুঁজছিল, ঠিক কোন স্টেশনে নামলে ঠিক হবে বুঝতে পারছিল না, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, হয়তো আমার হাতে ধরা বাংলা বই দেখেই. . . তারপর কথা হচ্ছিল। ঘটনাচক্রে একই স্টেশনে আমাকেও নামতে হতো, আমি তাকে কফি খাওয়ার কথা বললে সে রাজি হয়। আসলে তার কথাবার্তা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক মনে হচ্ছিল আমার। মেয়েটি কলকাতা থেকে এসেছে, একটা রিসার্চ প্রোজেক্টের কাজে। কলকাতারই একটা কলেজে পড়ায়, এটা তার পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ। রিসার্চের বিষয়টা হচ্ছে, ডায়াস্পোরার বাংলা সাহিত্য।. . . এ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?

- ধারণা. . . না তেমন কিছুতো . . . আচ্ছা, দাঁড়ান দাঁড়ান. . . যে বাঙালিরা বিদেশে বসে লেখেন? মানে অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ী. . .

- হা হা হা. . . ঠিক এইটাই বলবেন ভেবেছিলাম। ঘাবড়াবেন না বন্ধু, আমিও ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম মেয়েটিকে। তাতে সে বলল, না যাঁরা বিদেশে বসে বাংলা ভাষায় লেখেন, তাঁদের নিয়ে সে কাজ করছে। সেইসঙ্গে আরও বলল যে, রিসার্চের বিষয়টা establish করাই তার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, প্রথমত 'ডায়াস্পোরা', দ্বিতীয়ত, 'বাংলা ডায়াস্পোরা'— বিষয়দুটির অস্তিত্ব নিয়েই বহুলোক প্রশ্ন তুলেছে ইতিমধ্যে। 'ডায়াস্পোরা' শব্দটা এসেছে গ্রীক ক্রিয়াপদ 'ডায়াস্পেরিয়ন' থেকে, যার শব্দগত অর্থ, ছড়িয়ে পড়া, জমিতে বীজ ছড়ানোর মতো। গ্রীকদের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া প্রসঙ্গে এই শব্দটি প্রথম প্রযুক্ত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান বোঝানো ছাড়া এর মৌল অর্থের অন্য কোনো তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু ইংরাজিতে শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় কিছু অশুভ অনুষঙ্গ, যন্ত্রণার ইতিহাস। এর দ্বারা বোঝানো হোত কোনো জনগোষ্ঠীর মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নকে। ইহুদীরা যার আদি উদাহরণ, একাদশ শতকে দেশছাড়া আর্মেনীয়দের সম্পর্কে প্রযুক্ত হোত শব্দটি, আরও কিছুটা পরে আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে চালান যাওয়া কালো মানুষদের সম্পর্কেও। এখন কথা হোল, মেয়েটি আমাকে বোঝায়, অনেকে আজও 'ডায়াস্পোরা'র সঙ্গে যন্ত্রণা বা উৎখাত হওয়ার ইতিবৃত্তকে জুড়ে দিতে চান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই একথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে বা বলপ্রয়োগের কারণে নয়, মানুষ স্বেচ্ছায় আরও বিভিন্ন করণে ঘর ছাড়ে এবং এই অভিবাসনগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। ষাটের দশক থেকেই সমাজ-নৃতত্ত্ব বা ইতিহাসের তাত্ত্বিকেরা সব জাতের অভিবাসনকে একসঙ্গে আলোচনার মধ্যে আনতে একটা চাঁদোয়া শব্দ হিসেবে 'ডায়াস্পোরা'র ব্যবহার শুরু করেছেন কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকেই সেকথা মানতে রাজি নন. . .

- তাই বুঝি?

- বা বলা উচিত শর্ত সাপেক্ষে মানতে রাজি। মেয়েটি বলছিল, এখানেই ওর প্রোজেক্টের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের সূত্রপাত। 'ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্য' উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চার অঙ্গ হিসেবে আজকালকার

অ্যাকাডেমিক জগতে একটি বহুল প্রচলিত বিষয়। এর পরিপূরক 'ভারতীয় ডায়াস্পোরার সাহিত্য', বিশেষত, সলমন রুশদি বুকার প্রইজ় পাওয়ার পর থেকে। এখন ধরেই নেওয়া হয়, ডায়াস্পোরার সাহিত্য বলতে ইংরাজিতে লেখা সাহিত্যকেই বোঝানো হচ্ছে। মাতৃভাষায় লেখা কোনো জায়গাই কোথাও পায়না, কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে এই বিষয় নিয়ে কোনো পেপার দেয় না কেউ। অথচ, ডায়াস্পোরার অবস্থানে থেকে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার একটা ধারা কিন্তু বহুকাল ধরেই আছে এবং এখনও রীতিমতো জীবন্ত, বাংলা যার অন্যতম।

-তবে তাকে স্বীকার করা হয়না কেন?

- ওইটাই তো মজা। সেকথাই শুরুতে বলার চেষ্টা করছিলাম। অ্যাকাডেমিক জগতের হোমড়াচোমড়ারা এমন ভাবে অনেককিছুকেই 'ভ্যানিশ' করে দিতে পারেন, সমস্ত ক্ষেত্রের শক্তিমানেরাই অবশ্য তা পারেন। নিজের জমি থেকে গোঁত্তা খেয়ে ছিটকে পড়ে এমন মাথা ঘুরে গেল যে হয়তো কেউ বিশ্বাসই করে নিল যে ওটা তার জমিই নয়, কস্মিনকালেও ছিল না। মেয়েটি বলছিল, সে বেশ কয়েকবছর যাবৎ কাজ করছে, বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে, যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। হ্যাঁ, আমি বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা নাকি নিজেদের 'বাংলা ডায়াস্পোরার লেখক' বলতে রাজি নন. . .

-তার কারণ কী?

- কারণ. . . এককথায় বলা মুশকিল। মেয়েটি বলল, তার কাজ এখনো চলছে, ফলে কোনো নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছনোর সময় এখনো আসেনি. . . তবে আমাকে সে কয়েকজনের উদাহরণ দিয়েছে, কিছু কিছু সাক্ষাৎকারের অংশও শুনিয়েছে যা থেকে কতকগুলো সম্ভাব্য কারণের কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, কয়েকজন প্রবীন লেখক, যাঁরা যথেষ্ট খ্যাতিমানও, দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে থেকেও বাংলায় লিখছেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছেন এবং সেইভাবেই পরিচিত হতে চান। পরিচিত আসরের আরাম ছেড়ে হঠাৎ 'ডায়াস্পোরার সাহিত্য'র হৈ হট্টগোলের মধ্যে পড়তে চান না, বিশেষত ইংরাজি ভাষার লেখকদের সঙ্গে একটা তুলনা, সেটা অসম এবং অনুচিত হলেও, টেনে নিয়ে আসার সম্ভাবনা যেখানে থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, উপমহাদেশের অভিবাসীদের মধ্যে একটা সময় পর্যন্ত কোনো না কোনো দিন দেশে ফিরে যাবে— এই বিশ্বাসটা খুব প্রবল থাকে। হয়তো একুশ শতকের প্রজন্ম একসময় তা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠবে। যাই হোক, এখনো যাঁরা বাংলায় বা মাতৃভাষায় লেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো এই বোধ আর বিশ্বাসের জায়গাটা থেকেই লেখেন। ডায়াস্পোরার অবস্থানটাকে মেনে নিলে সেই 'myth of return' টা ভেঙে যায়। তৃতীয়ত, একটা খুব practical সমস্যা তৈরি হয় 'বাংলা ডায়াস্পোরা' বললে, কারণ তা সহজেই 'বাংলাদেশী ডায়াস্পোরা'র সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। গণ্ডোগোলটা আসলে পাকিয়েছে পশ্চিমী ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিকদের বর্গ বিভাজন। তাঁরা তো 'ভারতীয় এথনিসিটি', 'বাংলাদেশী এথনিসিটি' বলেই খালাস। আচ্ছা বলুন তো মশাই, 'ভারতীয় এথনিসিটি' বলে সত্যিই কি কিছু হয়?

- সত্যিই তো এতো বড়ো একটা দেশ, এতো ভাষা, ধর্ম, খাদ্যরুচি, সংস্কৃতি. . .

-ঠিক, সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম। এতো culture, subculture এর তো কোনো একঢালা বিচার চলে না। যাই হোক, একথা স্বীকার করতেই হবে, অনেক ক্ষেত্রে যেমন আলাদা, তেমন অনেক ক্ষেত্রে

overlapping ও আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশকে মিলিয়ে ধরতে হবে। যেসব বাঙালি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাদের পেছনের দেশটা বাংলাদেশ হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ হতে পারে আবার আসাম বা ত্রিপুরাও হতে পারে, কারণ সেখানেও একটা বড় সংখ্যক বাঙালি population আছে এবং তারা রীতিমতো বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে থাকে। সুতরাং, বাঙালি ডায়াস্পোরা মানেই বাংলাদেশী ডায়াস্পোরা নয়। আবার বিদেশে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিদের পরিচয় তারা ভারতীয়, কোনো নথি বা পরিচয়পত্রে তাদের 'বাঙালি' পরিচয় লেখা থাকে না। এবং দেখা গেছে, বাংলা ডায়াস্পোরা বললে বাংলাদেশী বলে ভুল হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকায় তারা অনেকে সেই পরিচয় সামনে আনে না। আবার ডায়াস্পোরার বাংলাদেশীদের মধ্যেও অনেক sub culture আছে. . .

-তাই নাকি?

-হ্যাঁ। 'সিলেটী' এবং 'ঢাকাই' বাংলাদেশীদের মধ্যে অনেক সময়েই বনে না। মেয়েটি বলছিল। এই নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প নাকি আছে তার ঝুলিতে।

-আপনি একদিনেই এত কথা শুনে ফেললেন?

- না, একদিনে নয়। মেয়েটি field study করতে এসেছে, আমেরিকার যেসব বাঙালিরা বাংলায় লেখালিখি করেন বা পত্রিকা চালান তাঁদের বাড়িতে থেকে, সেই গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে, তাঁদের বইপত্র সংগ্রহ করছে। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সে কুইনসে একজনের বাড়িতে ছিল, বলল পরদিন ওয়াশিংটন যাবে, ম্যানহাটন থেকে বাস ধরার কথা। আমারও কিছু কাজ ছিল ওখানে তাই মেয়েটিকে বললাম যদি আপত্তি না থাকে কিছুটা সময় হাতে নিয়ে এলে দেখা হতে পারে। ওর কাজের বিষয়ে আরও জানতে চাই। তো, সে সাগ্রহে রাজি হলো।

- বাঃ! বেশ অভিনব ব্যাপার তো! কলকাতার বাঙালি মেয়ে, আমারিকার বিভিন্ন শহরে অপরিচিত মানুষদের বাড়িতে গিয়ে থাকছে, কাজের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছে। কিন্তু সকলের কাছে কি এইভাবে পৌঁছনো সম্ভব?

-হ্যাঁ, প্রশ্নটা আমিও তাকে করেছিলাম। সে বলল, সব হয়তো সম্ভব হবে না, বাকিটা ই মেইল বা টেলিফোনে সারতে হবে। তবে বাংলায় যাঁরা লেখালিখি করেন তাঁরা নিয়মিত ব্যাবধানে কলকাতা বা ঢাকা যান, ও সেখানেও তাঁদের ধরার চেষ্টা করবে। তারপরেও হয়তো বাদ থেকে যাবেন কেউ কেউ , থাকাটাই স্বভাবিক। একটা গবেষণার উদ্দেশ্য তো ঠেসে ঠুসে সবাইকে আঁটানোর চাইতেও বেশি প্রবণতাটা দেখিয়ে দেওয়া।

-এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব?

- মেয়েটিতো দেখলাম খুবই আশাবাদী। সে বলল, এই লেখকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা বিখ্যাত, উভয়বঙ্গে পরিচিত নাম, কেউ কেউ ততটা বিখ্যাত না হলেও বেশ কিছুদিন যাবৎ লিখছেন, সাহিত্যিক হিসেবে একটা পরিচিতিও তৈরি হয়েছে। আবার অনেকে হয়তো শুধু নিজের জন্য লেখেন, কালে ভদ্রে এখানে ওখানে দু'একটি লেখা প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় এঁদের

উদ্যোগে, ইন্টারনেট জর্নালও আছে কয়েকটি। উচ্চশিক্ষিত পেশাদার থেকে হোটেলে ওয়েটারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন মানুষও আছে । কিন্তু তাঁরা সকলেই দিনের শেষে বাংলা অক্ষরমালার কছে নিজেদের হর্ষ,বেদনা, অভিমান, অনুরাগকে সঁপে দেন।

- লেখার মান কিরকম? সে ব্যাপারে মেয়েটি কি বলে?

- ভালো লেখা বেশ কিছু আছে। কেউ কেউ নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষাও করছেন, আঙ্গিক নিয়ে, ভাষা নিয়ে। আবার এমনও বহু লেখা ছাপা হচ্ছে বিভিন্ন কাগজে বা হয়তো বই হয়েও বেড়িয়েছে যাদের ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য বলা চলে না। তবে মেয়েটি সকলকেই তার সার্ভের অন্তর্গত করতে চায় বলল। তার আরও একটা কথা বেশ নতুন রকম মনে হলো আমার . . .

-সেটা কী?

- ও বলছিল, এক একটা ভাষা এক একটা জানালার মতো, পৃথিবীকে দেখার আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ। একই বাড়ির বিভিন্ন জানালা দিয়ে তো আপনি একই দৃশ্য দেখেন না, তেমনই, একই অবস্থানে থাকলেও প্রকাশের ভাষাটা বদলে গেলে দেখাটাও বদলে যায়। সুতরাং ডায়াস্পোরার অবস্থান থেকে ইংরাজিতে এবং বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত অনেকাংশে এক হলেও তার প্রকাশটা ভিন্ন।

- তাই বুঝি ‘ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্য’ বা ‘ভারতীয় ডায়াস্পোরার সাহিত্য’— বলাবাহুল্য, যা ইংরাজিতেই লেখা, সেই সাম্রাজ্যের তলা থেকে লুপ্ত সভ্যতার মতো বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে?

- বাঃ! ভালো বলেছেন তো. . . কিন্তু এ তো লুপ্ত নয়, জীবন্ত। তবে অনালোকিত। শীতকালে বরফ জমা জলাসয়ের গভীরে সঞ্চরমান জলজ প্রাণিদের মতো। ওপর থেকে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। জানতে হলে বরফটা ভাঙা দরকার. . .